ভারতের চর। তাঁরা ছিলেন সন্দেহপ্রবণ। তাদের আশঙ্কা ছিল এইসব মানুষ বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত করছে ও এর ফলে ছাত্রসমাজ বিপথগামী হয়ে পড়ছে। এসব পাকিস্তানের পক্ষে শুভ নয়। তাই দরকার হল নিষ্ঠুরতার নতুন দিশার সন্ধান। পাকিস্তানের সামরিক প্রধান ইয়াহিয়া খান চেয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের নিধন। তাঁরই নির্দেশে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় শুরু হয়েছিল 'অপারেশান সার্চলাইট'। গভীর রাতে ঢাকা শহরে তাঁর পরিকল্পনা রূপায়নের কাজে নেমেছিল পাক সেনাবাহিনী। কামান, ট্যাংকার, গোলাবারুদ আর গানপাউডার সহযোগে সুচিন্তিত ও পূর্বপরিকল্পিত নারকীয় হত্যাকাণ্ড। এর সঙ্গে যোগ দেয় রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী। তাদের নেতারা বিধান দেয়— "হিন্দু-মালাউন-কাফের জাহান্নামের চাইতেও খারাপ। তাই কাফের নিধন করো, ইসলাম বাঁচাও"। আর নারী? যুদ্ধের সময়ে নারী হচ্ছে "গণিমতের মাল"। তাই তাদের ওপর, বিশেষ করে তাদের শরীরের ওপর যা খুশি তাই করো। ফলে অবাধে চলল নারী ধর্ষণ। গ্রামের পর গ্রাম, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হল। প্রাণ বাঁচাতে নারী-পুরুষ সদলবলে নিজেদের বাড়িঘর, ঠাকুরদালান, গৃহপালিত জীবজন্তু, প্রিয় বাগান, তুলসীমঞ্চ ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। সম্মান বাঁচাতে মেয়েরা দিনের আলোয় আশ্রয় নিত দুর্গন্ধময় পচা পাঁকের জলে। আবার রাতের অন্ধকারে পাড়ি দিত নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে কখন পৌঁছে যেত সীমান্তের এপারে— আশ্রয় জুটত ক্যাম্পে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অনাহারে, কোলে শিশুসহ ও বেঁচে থাকার সামান্য রসদটুকু নিয়ে অবিরাম পথচলায় অনেকে পথের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অনেক গর্ভবতী মা রাস্তার পাশে গাছের তলাতেই জন্ম দিয়েছেন সন্তানের। আর যেসব নারী খানসেনাদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে রক্ষা পায়নি, তাদের সেনা ও রাজাকার ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়েছে। অকথ্য শারীরিক নির্যাতনের পরে তাদের চুল কেটে বিবস্ত্র করে রাখা হয়েছে। যাতে তারা ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যেতে না পারে। এই নারকীয় ঘটনাক্রমের সাক্ষী আশালতা হালদার, কল্পনা দে, ছবি দাস, সীমা হালদার, সীতা সমাদ্দার, অনুরূপা ভৌমিক ও ঝর্ণা রানি বিশ্বাস প্রমুখ ষোলোজন মহিলার করুণতর জবানবন্দি নিয়ে ৯ঋকাল বুকস প্রকাশ করেছে একটি অসামান্য গ্রন্থ— *ভাগফল ৭১ : মেয়েদের কথা*। শ্রীমতী ঝর্ণা বসু এই গ্রন্থের সংকলক ও সম্পাদক।

এতক্ষণ যা বলা বা লেখা হল— তা কেবল হিমশৈলের চূড়া। বাকি থেকে গেল অনেক গভীর থেকে গভীরতম বেদনাবিধুর অভিজ্ঞতা-সিঞ্চিত ঘটনা প্রবাহ। সেসব কথা বরং শোনা যাক সেই সব হতভাগ্য নারীদের জবানবন্দি থেকে— যা অক্ষরে সীমাবদ্ধ থেকেও আমাদের সামনে হাজির করে সেই বিধ্বস্ত সময়ের খণ্ড খণ্ড ছবি। "অশ্রু অন্তরে প্রান্তরে" এই শিরোনামে অণিমা মণ্ডল লিখেছেন— "নদীর পারে প্রচুর ভিড়।... অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমরা নদী পার হওয়ার সুযোগ পেলাম। পার হয়ে যেন স্বর্গে পৌঁছলাম। রাস্তার নীচে নোনাধুলোর ওপর কাঁথা পেতে সকলে একটু বসলাম নিশ্চিন্তে। বাচ্চাগুলো অসুস্থ, ভ্রান্ত, ক্লান্ত। ওরা শুয়ে পড়ল। আমার কেমন ঘোর লাগছে। মনে হচ্ছে এই যে নিরাপদে বসে আছি, সে সত্যি না মিথ্যে। আমার অসুস্থ বাচ্চাটা বিনা ওষুধে এখনও এই পৃথিবীর হাওয়া বুকে টেনে নিচ্ছে: এ কার আশীর্বাদে।... আধা ঘুম আধা জাগনো অবস্থায় একটা স্বপ্ন দেখে উঠে বসলাম। আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম, বাড়িতে ঠাকুরের থানের পাশে আলুথালু এক মা সন্তান হারিয়ে বিলাপ করছে। মুহূর্তে মনে হল— সে কি আমি?"

আতঙ্ক আর যন্ত্রণার ছবি ধরা পড়েছে ছবি দাসের লেখায়— "চৈতন্যের গভীরে"। শ্রীমতী দাসের বয়ানে— "দলবল লইয়া পাকসেনারা রাইফেল উঁচাইতে উঁচাইতে গোয়ালের পাশ দিয়া যাইবার

Scanned with CamScanner